শেখ মুজিবের জীবনে সবচেয়ে বড় ভুল কি ছিল

শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে লেখা হয়েছে এবং বলা হয়েছে অনেক। কিন্তু বেশির ভাগ লেখাই স্তুতিবাক্য। তাকে বানানো হয়েছে দেবতা আর নয় তো অতিমানব, যার পক্ষে কোনো ভুল করা সম্ভব নয়। এবং এটি তার জীবিতকালে যতোটা না হয়েছিল তার মৃত্যুর পর হয়েছে এর চেয়ে অনেক বেশি। এতে বোঝা যায় এ প্রশংসা ও স্তুতির প্রয়োজন মুজিবের নিজের নেই, প্রয়োজন তার উত্তরসূরিদের, তার সাগরেদদের।

মুজিব ছিলেন বাপের বেটা। নিজের পায়ের ওপর তিনি দাড়াতে পারতেন, দাড়িয়েছিলেনও। কিন্তু তার অনুগামীরা তা পারেন না। তাই মুজিবের কাধে ভর দিয়ে তাদের দাড়াতে হয়, এগুতে হয়। মুজিবকে দেবতা না বানালে সেটা সম্ভব নয়। নেতা–নেত্রী হিসেবে তারা এতো সাধারণ স্তরের যে, নিজের পায়ে নিজেরা চলতে তারা সমর্থ নন। তাই মহান নেতা মুজিবকে ধরে তাদের চলতে হয়। ফলে মুজিব নিজে সত্যই যা ছিলেন তার উপরে তাকে না তুলে তাদের উপায় নেই। নেতা–নেত্রী হওয়ার জন্য তাদের ভেতরে যোগ্যতার প্রশ্নে যে ফাক রয়েছে সে ফাক তাদের পক্ষে অন্যভাবে পূরণ করা বোধহয় সম্ভব নয়।

মুজিবের ঘোরতর বিরুদ্ধেও কেউ কেউ লিখেছেন। তারা এক কথায় বা দুই কথায় তুড়ি মেরে মুজিবকে উড়িয়ে দিয়েছেন। এটাও ভুল। দেখা যায়, লেখকেরা তাদের লেখায় বিষয়ের চেয়ে বিষয়ীর প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন বেশি। এসব লেখা কার্যকারণ সম্পর্কহীন, আবেগ ও অনুভূতিপ্রবণ। বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে শেখ মুজিব সম্পর্কে লেখা হয়নি বললেই চলে। নেতার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে উল্লেখযোগ্য কোনো লেখা আছে বলেও জানি না। মুজিব সম্পর্কে চোখে পড়ার মতো একটা লেখা আমার নজরে পড়েছিল। সে লেখাটি লিখেছিলেন প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক ও বাংলাদেশের সাবেক মন্ত্রী সিরাজুল হোসেন খান এবং লেখাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকার এক ইংরেজি সাপ্তাহিকীতে মাঝ সত্তরের দশকে। লেখাটি অবশ্য ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত হয়নি, হয়েছিল সাংবাদিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে। ফলে ইতিহাসের ব্যক্তিত্ব হিসেবে মুজিবের সঙ্গে সেখানে আমরা পরিচিত হতে পারিনি।

শেখ মুজিবের জীবনে দুটি একটি ঘটনার ওপর এ নিবন্ধে আলোকপাত করবো ও চেষ্টা করবো বিষয়ীর চেয়ে বিষয়ের ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে এবং সেই সঙ্গে ঘটনাকে বাইরে ও ভেতর থেকে দেখতে।

দুই.

শেখ মুজিব ছিলেন একজন অক্লান্ত কর্মী। কাজ করে, খেটে তিনি উপরে উঠেছেন। ফরিদপুর থেকে কলকাতার কলেজে এসে মুসলিম লীগের ছাত্র রাজনীতিতে তিনি সোচ্চার হন। তখনই তিনি অখণ্ড

ভারতের অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং তার প্রধান সারির শিষ্যদের একজন হয়ে যান। ১৯৪৬-এর নির্বাচনে মুসলিম লীগ ও সোহারাওয়ার্দীর পক্ষে প্রচারকার্যে তিনি ছিলেন অন্যতম একজন কর্মী। গ্রাম-গঞ্জে সোহরাওয়ার্দীর সভায় লোকজন জোগাড় করা ও অন্য কাজে তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তখন প্রতিষ্ঠিত হয় গুরু-শিষ্যের নিবিড় সম্পর্ক এবং এ সম্পর্ক সোহারাওয়ার্দীর জীবদ্দশায় বিচ্ছিন্ন হয়নি। ছেচল্লিশের নির্বাচনে সোহরাওয়ার্দী জয়ী হন এবং তিনি হন বিভাগপূর্ব বাংলার সর্বশেষ মুসলিম লীগ ও মুসলমান প্রধানমন্ত্রী। তবে তার এ আনন্দ বেশি দিন স্থায়ী হতে পারেনি। ১৯৪৭-এ কলকাতায় বঙ্গীয় আইনসভায় হবু পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের নেতা এবং মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের উদ্দেশ্যে পরিষদ সদস্যদের ভেতর ভোটাভুটি হয়। সে নির্বাচনে পরাজিত হন সোহরাওয়ার্দী ও বিজয়ী হন খাজা নাজিমুদ্দিন। সোহরাওয়ার্দী ও তার পক্ষীয় ব্যক্তিদের জন্য এটা ছিল একটা বড় ধাক্কা। তবে মুসলিম লীগে সোহরাওয়ার্দীর তখন যে অবস্থা ছিল তাতে এটা বোধহয় অবধারিত ছিল। ওই সময় বাংলায় দুইজন প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মুসলমান নেতা ছিলেন যাদের সঙ্গে ভারতীয় মুসলিম লীগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ-র সৌহার্দমূলক সম্পর্ক ছিল না এবং তখন জিন্নাহর সুনজরে না থাকলে মুসলিম লীগে উচ্চাসনে থাকা এক রকম অসম্ভব ব্যাপার ছিল।

ওই দুই ব্যক্তির একজন ছিলেন অবিভক্ত বাংলার এক সময়কার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক এবং অন্যজন বাংলার আর এক প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। আমার ধারণা, এর পুরো কারণ কেবল রাজনীতিতে নয়, এর ভেতরে একটা অংশ জুড়ে ছিল ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ। এ জন্য এরা দুজনেই ভুগেছেন। পক্ষান্তরে নাজিমুদ্দিন ছিলেন জিন্নাহর পেয়ারের লোক, বলতে গেলে, তার পোষা বিড়ালের মতো। জিন্নাহর সামনে বা জিন্নাহর পেছনে তার সম্পর্কে নাজিমুদ্দিন কখনো কোনো উচ্চবাচ্য করেছেন বলে শোনা যায়নি। সুতরাং সোহরাওয়ার্দী না হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের নেতা যে নাজিমুদ্দিন হবেন তা জিন্নাহ অবশ্যই চাইতেন। তবু নির্বাচনের সময় কেন্দ্র থেকে কলকাতায় তিনি চূন্দ্রীগড়কে পাঠিয়েছিলেন নাজিমুদ্দিনের জয় নিশ্চিত করতে। চূন্দ্রীগড় না এলেও মনে হয় না ওই নির্বাচনে সোহরাওয়ার্দী জয়লাভ করতেন। অবস্থাটা তখন ও রকমই ছিল। সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে ছিল প্রবল প্রভাবশালী মুসলিম দৈনিক *আজাদ* ও তার মালিক মাওলানা আকরম খা, যিনি তখন ছিলেন বঙ্গীয় মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট।

বাস্তব কারণেই শেখ মুজিবের সঙ্গে সোহরাওয়ার্দীর সম্পর্ক কিছুদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়। এখানে বোধহয় বলা চলে, এ সম্পর্ক বাংলাদেশের জন্য সব সময় শুভ হয়নি। সোহরাওয়ার্দীর প্রভাবে বা গুরুর সহযোগে এক সঙ্গে কাজ করার স্পৃহায় মুজিব কখনো কখনো এমন কাজ করেছেন যা বাংলার মানুষের জন্য মঙ্গলজনক হয়নি। আর সোহরাওয়ার্দী তো বাংলাদেশের আওয়ামী লীগকে ও বাংলাদেশকে (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানকে) তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করতে গভীরভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। একদিকে তিনি যেমন পাকিস্তানি শাসকদের তুষ্ট করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি তুষ্ট করেছিলেন পশ্চিমি শক্তি জোটকে। সোহরাওয়ার্দী জীবিত থাকলে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন

বাংলাদেশ সৃষ্টির সংগ্রামে তিনি কতোখানি শরিক হতেন তা বলা মুশকিল। বরং আদৌ হতেন কি না তাতে সন্দেহ হয়। এবং ওই অবস্থায় শেখ মুজিব কি করতেন তা হলফ করে বলা সহজ নয়।

এবার আসা যাক পূর্ব পাকিস্তান থাকাকালে ও পরে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর দুই একটি আন্দোলন, সংগ্রামে মুজিবের ভূমিকা এবং তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট সম্পর্কে দুই একটি কথায়, বিশেষ করে বাংলাদেশের জন্মের পর তার ভূমিকা সম্পর্কে। শেখ মুজিব ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতা। তার জীবন আওয়ামী লীগের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। আওয়ামী লীগ ছিল একটি নিয়মতান্ত্রিক দল। তারা বিশ্বাস করতো, ভোটাভুটির মাধ্যমে তারা ক্ষমতায় যাবে। নির্বাচনকে তারা মনে করতো তাদের হাতিয়ার। ১৯৫২–র একুশে ফেব্রুয়ারির লড়াইয়ে আইন অমান্য করে আওয়ামী লীগ কেন রাস্তায় নামবে না সেদিন তার যথাযথ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন পার্টির জেনারেল সেক্রিটারি শামসুল হক। তিনি বলেছিলেন, আওয়ামী লীগ একটি নিয়মতান্ত্রিক দল। ভোটের মাধ্যমে তারা ক্ষমতায় যেতে চায়। আইন অমান্য করে রাস্তায় নামলে যদি পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় তাহলে সে অজুহাতে মুসলিম লীগ সরকার নির্বাচন পিছিয়ে দেবে এবং তখন বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের পক্ষে সরকারি ক্ষমতা দখল করতে আরো দেরি হবে। এ ব্যাপারে মুজিবের সঙ্গে শামসুল হকের বিশেষ পার্থক্য ছিল বলে মনে হয় না। নিয়মতান্ত্রিক দলের নেতা হলে কি হবে মুজিব কিন্তু গান্ধীবাদী ছিলেন না। অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনে তিনি বিশ্বাস করতেন না। যদিও তিনি বিপ্লবী বা বিদ্রোহী ছিলেন না, সময়ে সময়ে তিনি বিপ্লব এবং বিদ্রোহের জিকির তুলেছেন। এগুলো নিজের ও তার পার্টির কাজে তিনি লাগাতে চেয়েছিলেন। তিনি হুশিয়ার ছিলেন তার ও জিকিরের ফলাফল যেন নিজের হাতের বাইরে না চলে যায়। বামপন্থীদের তিনি তার চরম শত্রু বলে মনে করতেন হয়তো পাকিস্তানি শাসকবর্গের চেয়েও বেশি। তবে মিত্রভাবাপন্ন বামপন্থীদের তিনি হাত করেছিলেন, সমাজতন্ত্রের আদর্শ বিসর্জন দিয়ে যারা এসে গাটছড়া বেধেছিলেন আওয়ামী লীগের সঙ্গে।

তিন.

১৯৭১–এর মার্চ মাস ছিল একটি যুগসন্ধিক্ষণের সময় আওয়ামী লীগের জন্য, বাংলাদেশের জন্য, পাকিস্তানের জন্য এবং সর্বোপরি আমাদের আলোচনার জন্য যা এখন সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক শেখ মুজিবের জন্য। মুজিব কি করবেন বা করবেন না তা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করছিল দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। দেশের স্বাধীনতার ছবি ছিল দৃষ্টির সামনে। শুধু অপেক্ষা করা হচ্ছিল তার ঘোষণার জন্য। আশা করা হয়েছিল ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের সভায় মহান নেতা ওই ঘোষণা করবেন। কিন্তু জাতি নিরাশ হলো। স্বাধীনতা বা স্বাধীনতার লড়াই শুরুর ঘোষণা না করে মুজিব কেবল বললেন সংগ্রামের কথা, মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামের কথা। তবে আওয়ামী লীগ বা শেখ মুজিব চান বা না চান, দেশ এগোচ্ছিল স্বাধীনতার দিকে, পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছিল স্বাধীন ও সার্বভৌম এক রাষ্ট্র। দেশের মানুষের পথ আটকে রেখেছিলেন নেতারা। এই পর্যায়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথ ত্বরান্বিত করেন

জুলফিকার আলি ভুট্টো। তিনি জানতেন, পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে তার পক্ষে দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়া সম্ভব নয়। তার পার্টির (পাকিস্তান পিপলস পার্টি) সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল কেবল পশ্চিম পাকিস্তানে, সমগ্র পাকিস্তানে নয়। পাকিস্তান গণপরিষদে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানে রয়েছে পাকিস্তান পিপলস পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা, যেমন পূর্ব পাকিস্তানে রয়েছে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। তাই যেমন পশ্চিম পাকিস্তানে ক্ষমতায় যাওয়া উচিত পিপলস পার্টির তেমনি পূর্ব পাকিস্তানে সরকার গঠন করা উচিত আওয়ামী লীগের। ভুট্টোর কথায় দুই পাকিস্তানের বা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া দুই দেশের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, পাকিস্তান নামটি থেকে যাবে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে আর কেবল এভাবেই ভুট্টো হতে পারবেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। হয়েছিলও তাই।

সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খানের চিন্তাধারা ছিল একটু ভিন্ন ধরনের। যদিও সে ধারণা ভুট্টোর ধারণা থেকে একেবারে যে পৃথক ছিল তা নয়। পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের অংশ থাকুক বা না থাকুক, তিনি চাইছিলেন বাঙালিদের একটা শিক্ষা দিতে। তাই মুজিবের সঙ্গে কথোপকথনের আড়ালে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে তিনি এনে চলেছিলেন সৈন্যসামন্ত ও গোলাবারুদ। মুজিব যে কেন এটা টের পাননি তা ভাবলে আশ্চর্য লাগে! তিনি কি এতোখানি নির্বোধ ছিলেন? পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের ভেতর প্রায় দেড় হাজার মাইলের ব্যবধান আর এ দুই অংশের ভেতরে অবস্থিত বাঙালিদের মিত্র এবং পাকিস্তানের শত্রু দেশ ভারত। তবু কি আওয়ামী লীগ ও তার নেতা এ ব্যাপারে কোনো আভাস পাননি?

অবশ্য এরপর যা হয় তা যেমন বিস্ময়ের আর তেমনই তা মুজিবের জীবন সম্পূর্ণ ওলট-পালট করে দেয়। তখনই বোধহয় শেখ মুজিব তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করেন যার জন্য আমৃত্যু তাকে খেসারত দিতে হয়েছে।

২৫ মার্চের কালো রাতে জাতি নিধনের জন্য পাকিস্তান বাহিনী বাঙালিদের ওপর ইতিহাসের নৃশংসতম হামলা শুরু করে। মুজিব তখন ছিলেন বাংলাদেশের মানুষের অবিসংবাদিত নেতা। তিনি কি করেন এ জন্য সবাই তার দিকে তাকিয়ে ছিল। অবস্থা তখন এমন আকার ধারণ করেছিল যে, বাঙালিদের জন্য স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নামা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাদের কয়েকটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে মুজিবের জীবদ্দশাতেই এবং মুজিব নিশ্চয় সেগুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনটি মুক্তিযুদ্ধের দৃষ্টান্ত আমরা এখানে তুলে ধরতে পারি যেগুলোর সঙ্গে মুজিব নিশ্চয় পরিচিত ছিলেন। একটি হয়েছিল চায়না-য়, আরেকটি কিউবা-য় এবং তৃতীয়টি হয়েছিল ভিয়েতনামে। ওই সব মুক্তিযুদ্ধে তাদের নেতারা - মাও সে তুং, ফিদেল ক্যাস্ট্রো ও হো চি মিন কি করেছিলেন তা বাংলাদেশের শেখ মুজিবের বোধহয় অজানা ছিল না। যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে তারা সে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যোদ্ধাদের পাশে তারা ছিলেন সব সময়। ইতিহাসের ডাক এসেছিল মুজিবের কাছে - এমন ডাক আগে তার কাছে কখনো আসেনি। সব কিছু তার জন্য প্রস্তুত ছিল, দেশ প্রস্তুত ছিল, জাতি প্রস্তুত ছিল, ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল, রণক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল।

সবাই তাকিয়েছিল সেনাপতির দিকে, যুদ্ধে তার পা বাড়ানোর অপেক্ষায়। কিন্তু মহান নেতা করলেন কি? লড়াইয়ে শরিক না হয়ে আক্রমণকারীদের কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করলেন। দেশের চরম দুর্দিনে দেশবাসীকে ঘাতকদের অস্ত্রের সামনে ফেলে রেখে তিনি আশ্রয় নিলেন কারাগারের নিরাপত্তায়। তার যুক্তি ছিল, তিনি ধরা না দিলে পাকিস্তানি ঘাতকেরা দেশে চরম হত্যালীলা চালাতো। এখানে যে প্রশ্নটি আসে তা হচ্ছে মুজিব ধরা দেয়ার পর দেশে হত্যালীলা কি কিছু কমেছে? মুজিবেরই হিসাব অনুযায়ী ত্রিশ লাখ মানুষ জীবন হারিয়েছে। মুজিব ধরা না দিলে এ সংখ্যা কি আরো বেশি হতো? কতো বেশি হতো?

এরপর যে প্রশ্নটি আসে, মুজিব কি আত্মসমর্পণ করেছিলেন দেশবাসীর জীবন বাচানোর জন্য, না অন্য কোনো কারণে? এর জবাব দিতে গেলে বস্তুগতভাবেও কিছুটা মনস্তত্বগত দৃষ্টিতে মুজিবের জীবনে ঘটা ঘটনা ও তার চারিত্রিক বৈশিষ্টের ওপর আলোকপাত করার একটু বোধহয় প্রয়োজন রয়েছে। আন্দোলনের চূড়ান্ত মুহূর্তে তাকে অনেকবার আমরা দেখেছি চরম প্রতিকূলতার সম্মুখীন না হয়ে তিনি রয়েছেন কারাগারের অন্তরালে। এ রকম আমরা দেখেছি, ১৯৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারির লড়াইয়ের সময়। তিনি তখন ছিলেন কারাগারে। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের চূড়ান্ত মুহূর্তে আমরা তাকে দেখি কারাগারে। এর চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখলাম ১৯৭১-এর ২৫ মার্চে। দেশকে চরম দুর্দশার মধ্যে ফেলে আত্মসমর্পণ করে তিনি চলে গেলেন কারাগারের নিরাপত্তায়। যুদ্ধে কোনো সেনাপতি যদি তার সৈন্যদের যুদ্ধ করতে বলে নিজে শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করেন তাহলে সেটা হয় এক অমার্জনীয় অপরাধ। মুজিবের বেলায় কি বিচারের এই নিয়ম প্রয়োগ করা যাবে?

মুজিবকে আমি একজন গতানুগতিক সেনাপতি বলে মনে করি না। সুতরাং কোনো বিচারের নিয়মের মধ্যে তাকে ফেলার আগে বিষয়টির আরো বিশ্লেষণের প্রয়োজন। শেখ মুজিব কোনো টাইপ চরিত্র নন, তিনি একজন একক ব্যক্তি, একটি ব্যক্তিত্ব। তার নিজস্ব কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট ছিল। রাজনৈতিক কলাকৌশলও তার হয়তো অন্যদের থেকে ভিন্ন ছিল। ভিন্নভাবে রাজনীতি ও রাজনৈতিক কলাকৌশল প্রয়োগের চিন্তা তিনি করতেন। নেহরু-র চিন্তা-ভাবনা ছিল গান্ধীর থেকে ভিন্ন। আবার জিন্নাহ ছিলেন তাদের দুজন থেকে আলাদা। শেখ মুজিবের বেলায় প্রথম যে প্রশ্নটি মনে আসে তা হচ্ছে, মুজিব কি চরম মুহূর্তে প্রত্যক্ষভাবে শত্রুর মুখোমুখি দাড়াতে সাহস করতেন না? তিনি কি কাপুরুষ ছিলেন?

সরাসরি এর জবাব দিলে জিনিসটির সরলীকরণ হয়ে যায়। মুজিবকে আমি *কাপুরুষ* বলে মনে করি না। তবে আমরা যা দেখেছি তাতে মনে হয় না ব্যক্তিগত সাহসের ব্যাপারে শেখ মুজিব বাংলার আর দুজন রাজনীতিক - শেরেবাংলা ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সমকক্ষ ছিলেন। সাহসিকতার ব্যাপারে সাধারণত দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী রাজনীতিকদের ভেতর একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। দলে ভারী থাকলে দক্ষিণপন্থীরা দৃশ্যমানভাবে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। কিন্তু বামপন্থীরা লোকবল, জনবল তুচ্ছ করে ঝাপিয়ে পড়েন সমরে। এ জন্যই হয়তো মাও সে তুং, হো চি চিন বা ফিদেল ক্যাস্ট্রো হতে পারেননি বাংলার মহান দক্ষিণপন্থী নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। মুজিব হয়তো মনে করতেন, রণক্ষেত্র থেকে দূরে জেলে থাকলেও তার যে ভাবমূর্তি স্পষ্ট হয়েছে তা ক্ষুণ্ন হবে

না। হয়নিও অনেক দিন। কিন্তু পরিশেষে একাত্তরের মার্চে মুক্তিযুদ্ধ ও যোদ্ধাদের ফেলে রেখে আত্মসমর্পণ করে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করার ফল মুজিবের জন্য নিয়ে এসেছিল এক অতি দুঃখজনক পরিণতি। বাকি জীবন এর জন্য তাকে খেসারত দিতে হয়েছিল। ঘাতকদের হাতে তার মৃত্যুও এ জন্য ত্বরান্বিত হয়।

নয় মাস পর পাকিস্তান থেকে মুক্ত হয়ে ১০ জানুয়ারি তিনি যখন দেশে ফিরে এলেন তখন যে ভূখণ্ড রেখে গিয়েছিলেন বাংলাদেশ তা থেকে হয়ে গিয়েছিল সম্পূর্ণ আলাদা। এর মধ্যে বহু মানুষের জীবন গেছে, মা-বোনের গেছে ইজ্জত এবং দুঃখ-কষ্ট-লড়াইয়ে বাংলাদেশের মানুষ হয়ে গেছে নতুন এক মানুষ। পরাধীন ভূখণ্ড হয়েছে স্বাধীন। আর এসবই হয়েছে মুজিবের অবর্তমানে। এসবের কোনো চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা মুজিবের ছিল না। কল্পনায় মুজিব হয়তো কিছু দেখতে পেতেন। কিন্তু কল্পনা বাস্তবতার স্থান পূরণ করতে পারে না। সদ্য অভিজ্ঞতালব্ধ দেশের মানুষের কাছে মুজিব হয়ে পড়েছিলেন একজন বাইরের লোক। মুজিবেরও তাদের ভেতরে ঢুকতে খুব অসুবিধা হচ্ছিল। সভা-সমিতিতে বিশেষ করে তার নিজের পার্টির ভেতরে আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের মুখোমুখি দাড়ানো তার পক্ষে সহজ হচ্ছিল না। তারা সবাই যখন উল্লেখ করতেন লড়াই, হত্যা ও ধর্ষণের কথা তখন মুজিবের চুপ করে থাকা ছাড়া কোনো উপায় থাকতো না। কেননা ওসব দেখার কোনো অভিজ্ঞতা তার হয়নি। মুজিবের ভাবমূর্তি মুজিবকে টিকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু তাতে মুজিব সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। তার ভুলের মাশুল তাকে এভাবে দিতে হবে তা তার মনে হয়নি। তার ওপর আবার হাটে-মাঠে, পথে-প্রান্তরে নয় মাস খেটেবেড়ানো অনুজপ্রতিম তাজউদ্দিন আহমদ হয়ে পড়ছিলেন তার প্রতিদ্বন্দ্বী। এটা রুখতে তাজউদ্দিনকে তার মন্ত্রিসভা থেকে তিনি সরালেন। মুজিব এর কারণে হিসাবে দেখালেন তাজউদ্দিনের অতিমাত্রায় ভারতপ্রীতি। আসল কারণ ছিল মুক্তিযোদ্ধা তাজউদ্দিনের মুখোমুখি দাড়াতে মুজিবের অসুবিধা হচ্ছিল। তাজউদ্দিন চুপচাপ সরে গেলেন। তিনি বিদ্রোহী ছিলেন না। নিজের অবস্থান ঠিক রাখতে এটা ছিল মুজিবের একটি পদক্ষেপ মাত্র।

এ পদক্ষেপ নিয়েও মুজিব শান্তির অধিকারী হতে পারেননি। তার সমস্যা ছিল ব্যাপক। তিনি ছিলেন নিজেই সমস্যা। নিজেকে তিনি দেশের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারছিলেন না। তার মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতার পক্ষে এটা ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। মুজিব দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন। কি করবেন বা করবেন না, কিভাবে পরিস্থিতির উন্নতি করা যায় তা তিনি ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না। তিনি চাইছিলেন নতুন কিছু করতে, কিছু উদ্ভাবন করতে। দেশের সৃষ্টিতে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। তাই তিনি চাইছিলেন দেশের জন্য এমন কিছু করতে যা আগে কেউ করেননি এবং যার দ্বারা সবাইকে তাক লাগানো যায়। অবশ্যই তিনি চাইছিলেন তার হৃত অবস্থানকে ফিরিয়ে আনতে। দেখাতে চাইছিলেন কিভাবে তার ভুল তিনি শুধরেছেন।

শেখ মুজিবের নিশ্চয় মনে হয়েছিল, তার অবস্থা এখন আগের চেয়ে (বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার আগে) দুর্বল। তাই তিনি বানালেন রক্ষীবাহিনী। শুধু আত্মরক্ষার প্রয়োজনে নয়, তার কথা মতো কাজ

যেন সহজে হয় সে জন্যও। মুজিব দেখতে পাচ্ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের অবস্থা এমন হয়েছে যে, পুলিশ ও আর্মি দিয়ে সরকারি সব কাজ ঠিক মতো হচ্ছিল না।

এরপর মুজিব করলেন রাজনীতিতে আর একটি উদ্ভাবন। একদলীয় শাসনের প্রবর্তন এবং দলের নাম দিলেন বাকশাল। বাংলাদেশ রাষ্ট্রে একদলীয় শাসন গোড়াতেই ছিল বিরাট এক গলদের ব্যাপার। যে সমাজে শ্রেণী কেবল একটিই রয়েছে, সেখানে একটি পার্টি চলতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো শ্রেণী বিভক্ত সমাজে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সেখানে তা হবে কেবল উপর থেকে জোর করে চাপানো। জাতির ওপর জোর করে বাকশাল চাপানো তখন মুজিবের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং বিসমিল্লাতেই খতম হলো বাকশাল। আওয়ামী লীগের ভেতরেও বাকশাল নিয়ে উপদলের সৃষ্টি হলো। মুজিব আরো দিশাহারা হয়ে পড়লেন। পার্টির সঙ্গে তার সম্পর্ক আগে কখনো এমন হয়নি।

শেখ মুজিবের আসল শক্তি ছিল জনগণ। জনগণের সঙ্গে তার আদান-প্রদান ছিল এবং সেখান থেকে তিনি সংগ্রহ করতেন তার শক্তি। সে শক্তিতে পড়লো ভাটা। পার্টি হয়ে দাড়ালো নেতা ও জনগণের ভেতরে পর্দা। মুজিবের চাটুকারেরা স্তুতিবাক্যে তাকে ভুলিয়ে জানালো, জনগণ খুব ভালো আছে এবং তাদের সঙ্গে তার আগের মতো যোগাযোগ না রাখলেও চলবে। মুজিব এভাবে হয়ে গেলেন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। মুজিব তখন পড়লেন তার জীবনের সবচেয়ে বড় বিপদে। শত্রু ঘাতকেরা আগে থেকেই ওৎপেতে ছিল। মুজিবের এ দুর্বল অবস্থায় তাকে আঘাত করা তাদের পক্ষে হয়ে গেল সহজ।

শেখ মুজিবের চরিত্র একটি বিয়োগান্ত নাটকের নায়কের মতো। শত্রু তার কাছাকাছি ছিল ঠিক কিন্তু বিয়োগান্ত নাটকের নায়কের মতো তিনিও ছিলেন নিজের পতনের জন্য কিছুটা দায়ী। গৃক নাটকে নায়ক-নায়িকাদের পতন হতো। কেননা দেবতারা তাদের বা তাদের পূর্ব পুরুষের কৃতকর্মের জন্য নায়ক-নায়িকাদের পতন ঘটাতেন। এই পতনের জন্য নায়ক বা নায়িকাকেই দায়ী মনে করা হতো। তাদের ভাগ্যই তাদের শত্রু এবং এ ভাগ্যের জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। আধুনিক যুগের ট্র্যাজেডি মূলত গৃক ট্র্যাজেডির মতো হলেও নায়কের মধ্যে নিয়তির প্রকাশ একটু ভিন্নভাবে হয়। এই ট্র্যাজেডিতে দেবতা নয়, নিয়তি কাজ করে চরিত্রের ভেতর দিয়ে। গৃক ট্র্যাজেডির মতো এখানেও নায়ক তার পতনের জন্য নিজে কিছুটা দায়ী। তাই নায়ক এখানে মানুষ, অতিমানব বা দেবতা নয়। এবং মানুষ বলেই সে ভুল-ভ্রান্তির উর্ধে নয়। আধুনিক বাংলার নায়ক শেখ মুজিব নিজের ভুলের জন্য ভুগেছেন আর তার ভুল-ভ্রান্তির সুযোগ নিয়েছে তার শত্রুরা সবংশে তাকে নিধন করে। এর চেয়ে দুঃখজনক ঘটনা বিশ্বের ইতিহাসে বেশি ঘটেছে বলে মনে হয় না।

মুজিব হত্যার পর প্রথম যে প্রশ্নটা মনে আসে, ওই হত্যার জন্য দায়ী কারা এবং তার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান হওয়া উচিত। আমি বিশ্বাস করি না শুধু বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর তিন চারজন ব্যক্তি যেমন ফারুক, রশিদ, ডালিম ও হুদা এ হত্যার জন্য দায়ী। আমার ধারণা, এমন একটা হত্যাকাণ্ডের পেছনে বড় রকমের ষড়যন্ত্র ছিল এবং তাতে বিদেশি শক্তির জড়িয়ে থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু আদালতে কেবল বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর ওই কয়জনেরই বিচার হয়েছে, অন্যদের সম্পর্কে প্রশ্ন

তোলা হয়নি। এখানে একটা জিনিস আমাদের জানা দরকার। কোনো রাষ্ট্রনেতা খুন হলে সাধারণত যথাযথভাবে তার বিচার হয় না।

উনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট এব্রাহাম লিংকন ঘাতকের হাতে খুন হয়েছিলেন। কিন্তু তার সুষ্ঠু বিচার হয়নি। সত্যিকার খুনী বোধহয় ধরা পড়েনি। ওই ঘটনার একশ বছর পর আর এক আমেরিকান প্রেসিডেন্ট খুন হন। তিনি কেনেডি। তার হত্যার বিচারও ঠিকমতো হয়েছে কি না সন্দেহ এবং আসল খুনী যে ধরা পড়েছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না। পঞ্চাশের দশকে আততায়ীর হাতে খুন হন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান। তার আসল হত্যাকারীকে আজও বোধহয় খুজে পাওয়া যায়নি। এসব সত্ত্বেও আশা করেছিলাম, মুজিব হত্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত হবে, হত্যাকারী ও ষড়যন্ত্রকারীর বিচার হবে এবং দোষীদের সমুচিত শাস্তি দেয়া হবে। দুঃখের বিষয়, এমন লক্ষণ দেখা যায়নি।

মুজিব হত্যার ব্যাপারে কোনো আলোচনাই সম্পূর্ণ হবে না যদি আমরা মুজিবের বিরুদ্ধে তার পার্টির কিছু ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতার উল্লেখ না করি। তারা ঘাতকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে থাকলেও দিতে পারেন। আর না দিয়ে থাকলেও তাদের অমন অবস্থানে ঘাতকদের সুবিধা হয়। এ ব্যাপারে গভীর তদন্ত হওয়া উচিত ছিল। আওয়ামী লীগ দল এ তদন্তের ভার নিজেরাই নিতে পারে। কিন্তু তাদের নেতার সঙ্গে কে কে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তা বের করতে তারা আগ্রহী বলে মনে হয় না। খন্দকার মোশতাক তো বিশ্বাসঘাতকদের একজন ছিলেনই এবং তার সঙ্গে বোধহয় ছিলেন মুজিব ক্যাবিনেটের আরো কেউ কেউ। ওই ক্যাবিনেটের অর্ধেক সদস্য ঘাতক ক্যাবিনেটে যোগদান করেন। রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী যাকে মুজিব ওই পদে বসিয়েছিলেন তিনি হয়েছিলেন নতুন (ঘাতক) ক্যাবিনেটের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। মুজিবের পেয়ারা একজন সদস্য ছিলেন যিনি লাফ দিয়ে এসে নতুন মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। পরে আবার সুবিধাজনক সময়ে তিনি আওয়ামী লীগে ফিরে যান। এবং ১৯৯৬-এর আওয়ামী সরকারের আমলে জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সরকারি ও আধা সরকারি অফিসে টাঙাতে হবে এ জন্য সংসদে যে বিলটি উথাপিত হয় সেটি তোলেন ওই চিহ্নিত সদস্য যিনি ১৯৭৫-এ মুজিব মন্ত্রিসভা ছেড়ে যোগদান করেন মুজিব হত্যাকারী ক্যাবিনেটে এবং পরে আবার যিনি ফিরে যান আওয়ামী দলে! আর বিশ্বাসঘাতকতা যারা করেননি সেই আওয়ামী নেতা-উপনেতারাই বা কোথায় ছিলেন মুজিব হত্যার পর? আজকের দিনের যারা নেতা সেই তোফায়েল, রাজ্জাক সবাই ছিলেন সেদিন মুজিবের অনুচর। মুজিব দ্বারা তারা পুষ্ট হয়েছিলেন এবং মুজিবই তাদের বসিয়েছিলেন তাদের স্ব স্ব আসনে। কিন্তু মুজিবের চরম দুর্দিনে তারা কেউ তার পাশে এসে দাড়াননি। আওয়ামী লীগ তখনো ছিল দেশের সবচেয়ে বড় পার্টি। দেশের সর্বত্র ছিল তাদের শাখা-প্রশাখা। পার্টির কোনো নেতাকেও তখন দেখা যায়নি কর্মীদের ঘাতকদের বিরুদ্ধে জড়ো করতে। এ সাহস কোনো আওয়ামী নেতার মধ্যে দেখা যায়নি, এমনকি এ সাহস আমরা মুজিবকন্যা শেখ হাসিনার মধ্যেও দেখিনি। তিনি যদি তখন সাহসী হয়ে দেশে ফিরে ঘাতকদের মোকাবেলা করতেন তাহলে জাতির হৃদয়ে তিনি চিরবীরাঙ্গনা হয়ে থাকতেন এবং বিশ্ববাসীর কাছে বিশ্বের অতি বিরল সাহসিনীদের একজন হিসেবে

তার নাম থেকে যেতো। পরবর্তী কালে তিনি প্রধানমন্ত্রী বা বিরোধী দলীয় নেত্রী হতেন কি হতেন না তাতে কিছুই যেতো আসতো না। কিন্তু হাসিনা ওই বিরল বীরাঙ্গনাদের একজন হতে পারেননি। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট কেবল একজনকে দেখা গেছে যিনি ছিলেন একজন কর্নেল তিনি মুজিবের ওপর হামলার খবর শুনে নৈশবাস পরিহিত অবস্থায় এসেছিলেন ধানমন্ডির ৩২ নাম্বার বাড়িতে। এর ফলে কি হতে পারে এ ধারণা তার ছিল, তবু তিনি এসেছিলেন। যা হবার তাই হলো। ঘাতকেরা তাকে খুন করে। ওই কর্নেলের সঙ্গে আওয়ামী লীগের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তিনি ছিলেন একজন সাহসী বীর! আওয়ামী লীগ বীরদের পার্টি নয়।

পরিশেষে শেখ মুজিবের কথায় আবার ফিরে আসি। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের এক সময়ের মহান নেতা। এক সময়ের জন্য নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন দেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অবিসংবাদিত নেতা। তিনি সত্যই কি ছিলেন তা আমাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে। তিনি আমাদের ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। তাকে *জাতির জনক* ও *বঙ্গবন্ধু* খেতাব দিয়ে তার বিমূর্ত ভাবমূর্তি খাড়া করে বিশ্লেষণের বাইরে রাখা তার প্রতি সুবিচার করা নয়। মুজিব ছিলেন একজন মানুষ, রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ। আওয়ামী লীগ তাকে বানিয়েছে দেবতা, অতিমানব। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মুজিবকে জানা বা বোঝা সম্ভব নয়। আওয়ামী লীগের বাইরে যারা আছেন তারা এ কাজে এগিয়ে এলে বেশি সফল হবেন বলে মনে হয়।

মুজিব নিজের সম্পর্কে যা বুঝতে পারেননি তা আমাদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের সবার জন্য এর প্রয়োজন রয়েছে।

মাহমুদ হাসান

লন্ডন থেকে